১

কম্পিউটার পরিচিতি
Introduction to Computer

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম হলো কম্পিউটার। এটি একটি প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা ক্রমান্বয়ে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক গাণিতিক এবং লজিক্যাল অপারেশন সম্পন্ন করে। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য কম্পিউটার আধুনিক মানব সভ্যতার জাদুর কাঠি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা হলো দ্রুতগতি, বিশ্বাসযোগ্যতা, সূক্ষ্মতা, ক্লান্তিহীনতা, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত, বহুমুখিতা, স্বয়ংক্রিয়তা ইত্যাদি। এ সকল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব কাজেই কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত তিনটি ধাপের মাধ্যমেই কম্পিউটার যেকোনো সমস্যার সমাধান করে থাকে। ইনপুট গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আউটপুট প্রদান। তবে বর্তমান প্রযুক্তিতে কম্পিউটারের বিস্ময়কর অবদানের অন্তরালে রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের নিরলস পরিশ্রম, উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার স্বাক্ষর। প্রাচীনকালে মানুষ সংখ্যা বোঝানোর জন্য ঝিনুক, নুড়ি, দড়ির গিঁট ইত্যাদি ব্যবহার করত এবং তথ্য সংরক্ষণের জন্য মাটির তৈরি ছক, সারণি বা গাছের পাতা ব্যবহার করত। গণনার কাজে সহায়তার জন্য প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক কৌশল প্রচলিত থাকলেও অ্যাবাকাস নামক একটি প্রাচীন গণনার যন্ত্রকেই কম্পিউটারের ইতিহাসে প্রথম যন্ত্র হিসেবে ধরা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১.১ : কম্পিউটার ও কম্পিউটারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পাঠ- ১.২ : কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম

পাঠ- ১.৩ : কম্পিউটারের প্রকারভেদ

পাঠ-১.১ কম্পিউটার ও কম্পিউটারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

Computer & Brief History of Computer

উদ্দেশ্য

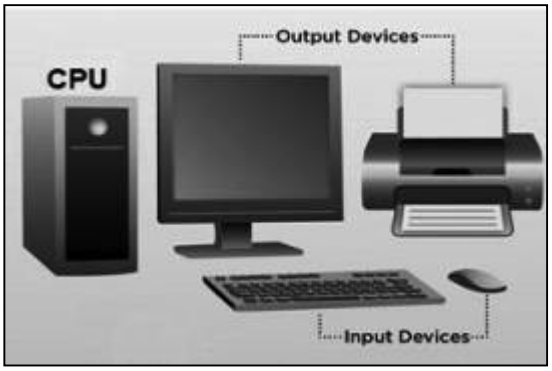
এ পাঠ শেষে আপনি

- কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- কম্পিউটারের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কম্পিউটার

Computer

কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক বর্তনী ও যান্ত্রিক সরঞ্জামের সমন্বয়ে সংগঠিত প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা ডেটা গ্রহণ করে, প্রক্রিয়াকরণ করে, ফলাফল সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে ফলাফল প্রদান করে। অর্থাৎ কম্পিউটার এমন এক ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা ইনপুট হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডেটাসমূহ কেন্দ্রিয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের সাহায্যে প্রক্রিয়াকরণ করে আউটপুট হার্ডওয়্যারসমূহের মাধ্যমে ফলাফল প্রদান করে থাকে। ল্যাটিন শব্দ কম্পিউটেয়ার (Computare) থেকে ইংরেজিতে কম্পিউটার (Computer) শব্দটির উৎপত্তি। Compute শব্দের অর্থ হলো গণনা করা। তাই কম্পিউটারের আভিধানিক অর্থ হলো গণনাকারী বা হিসাবকারী যন্ত্র।



চিত্র ১.১.১ : ডেস্কটপ কম্পিউটার



চিত্র ১.১.২ : ল্যাপটপ কম্পিউটার

বাংলাদেশের কপিরাইট আইনে কম্পিউটারের দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে, "কম্পিউটার অর্থ মেকানিক্যাল, ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, ডিজিটাল বা অপটিক্যাল বা অন্য কোনো পদ্ধতির ইমপালস ব্যবহার করিয়া লজিক্যাল বা গাণিতিক যেকোনো একটি বা সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে, এমন তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম।"

আবার অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে, 'কম্পিউটার হলো হিসাব-নিকাশ করা অথবা অন্য কোনো যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন করে।' *(Electronic device for storing, analysing and producing information for making calculations, or controlling machines.)*

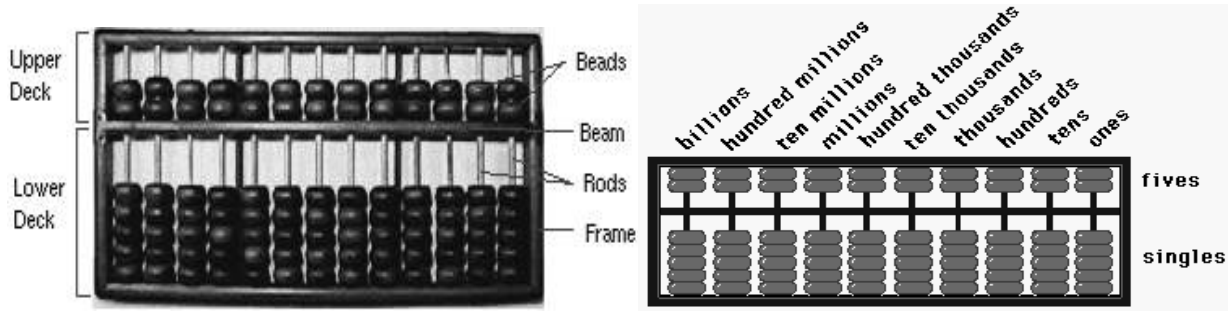
আসলে কম্পিউটার হচ্ছে একটি ইলেকট্রনিকস যন্ত্র, যা সংরক্ষিত প্রোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। যেমন কম্পিউটার দিয়ে গাণিতিক হিসাব যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায়; এমনকি যুক্তি এবং সিদ্ধান্তমূলক কাজও করা যায়। এছাড়া আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে গান দেখতে ও শুনতে পারি এবং বিভিন্ন ধরনের গেমসও খেলতে পারি। গবেষণামূলক কাজ থেকে শুরু করে অফিস-আদালত, এমনকি ব্যক্তিগত কাজেও কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটারের আবিষ্কারের ইতিহাস
History of Computer Invention

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং বহুল প্রচলিত শব্দটি হচ্ছে কম্পিউটার। বর্তমান প্রযুক্তিতে কম্পিউটারের বিস্ময়কর অবদানের অন্তরালে রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের নিরলস পরিশ্রম, উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার স্বাক্ষর। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গণনার জন্য উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৌশল ও প্রচেষ্টাকে কম্পিউটার উদ্ভাবনের প্রাচীনতম ইতিহাস বলা যায়। গণনার কাজে সহায়তার জন্য প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক কৌশল প্রচলিত থাকলেও অ্যাবাকাস (Abacus) নামক একটি প্রাচীন গণনার যন্ত্রকেই কম্পিউটারের ইতিহাসে প্রথম যন্ত্র হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ বলা যায় অ্যাবাকাস থেকেই কম্পিউটারের ইতিহাসের শুভযাত্রা।

অ্যাবাকাস
Abacus

অ্যাবাকাস প্রাচীনতম গণনা যন্ত্র, যা একটি ফ্রেমে সাজানো গুটির স্থান পরিবর্তন করে গণনা করার কাজ পরিচালিত করে। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অ্যাবাকাসের প্রথম ব্যবহার শুরু হয়েছিল চীনে বলে জানা যায়। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ও এশিয়ায় অ্যাবাকাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অ্যাবাকাস জাপানে প্রবর্তিত হয়। চীনে অ্যাবাবাসকে বলা হয় সুয়ানপান (Suanpan), জাপানে সরোবান (Soroban) এবং রাশিয়াতে বলা হয় স্কেটিয়া (Sketia)।



চিত্র ১.১.৩ : অ্যাবাকাস গণনা যন্ত্র

অ্যাবাকাস শব্দটির অর্থ হলো গণনাকারী বোর্ড। এটি কাঠের তৈরি আয়তাকার কাঠামো যাতে ফ্রেমের ভেতরে সুতা বা তার বেঁধে বিভিন্ন রঙের গুটি বা বল সাজানো থাকে। সাধারণত প্রত্যেক তারের ওপরের দিকে দুটি এবং নিচের দিকে পাঁচটি বল বা গুটি লাগনো থাকে। সবার ওপরের তারকে ধরা হতো এককের ঘর, দ্বিতীয় তারটি ছিল দশকের এবং তৃতীয় তারটি ছিল শতকের। এভাবে প্রত্যেক তারে একটি করে মান থাকত। ফ্রেমের মাঝখান বাম, ডান কিংবা ওপর-নিচ বিভক্ত থাকত। তবে উলম্ব দন্ডগুলো একক, দশক, শতক ইত্যাদি বোঝানো হত। গুটিগুলো সঞ্চালন করে অ্যাবাকাসের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি কাজ করা যেত।

নেপিয়ারের অস্থি বা হাড়
Napier's bone

১৬১৪ সালে স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ জন নেপিয়ার (John Napier) লগারিদমের সারণি আবিষ্কার করেন যার ফলে অনেক জটিল গাণিতিক হিসাব সহজ হয়। এর তিন বছর পর তিনিই ১৬১৭ সালে দাগকাটা এবং সংখ্যা বসানো দণ্ড ব্যবহার করে সংখ্যাভিত্তিক গণনাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। এসব দণ্ড নেপিয়ারের অস্থি নামে পরিচিত। নেপিয়ারের যন্ত্রে দশটি দণ্ড এবং প্রত্যেক দণ্ডে দশটি করে সংখ্যা ছিল। ফলে গুণ ও ভাগের কাজ করা সহজ হয়ে যায় এবং যন্ত্রটি ব্যবহার করে, এমনকি বর্গমূল নির্ণয় করা সম্ভব ছিল।

Napier's Bones

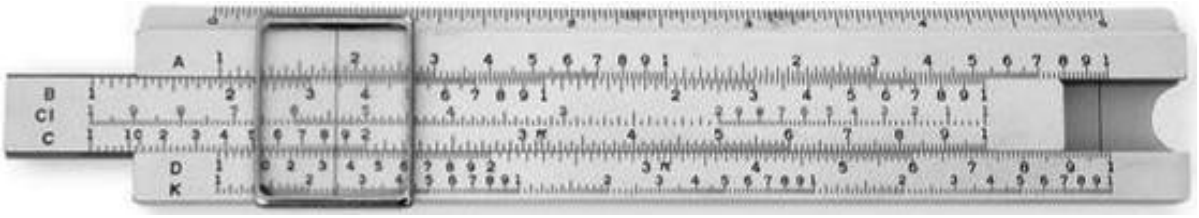
Cut along the vertical lines to make a strip for each number.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0/1	0/2	0/3	0/4	0/5	0/6	0/7	0/8	0/9
2	0/2	0/4	0/6	0/8	1/0	1/2	1/4	1/6	1/8
3	0/3	0/6	0/9	1/2	1/5	1/8	2/1	2/4	2/7
4	0/4	0/8	1/2	1/6	2/0	2/4	2/8	3/2	3/6
5	0/5	1/0	1/5	2/0	2/5	3/0	3/5	4/0	4/5
6	0/6	1/2	1/8	2/4	3/0	3/6	4/2	4/8	5/4
7	0/7	1/4	2/1	2/8	3/5	4/2	4/9	5/6	6/3
8	0/8	1/6	2/4	3/2	4/0	4/8	5/6	6/4	7/2
9	0/9	1/8	2/7	3/6	4/5	5/4	6/3	7/2	8/1

চিত্র ১.১.৪ : নেপিয়ারের অস্থি

স্লাইড রুল
Slide Rule

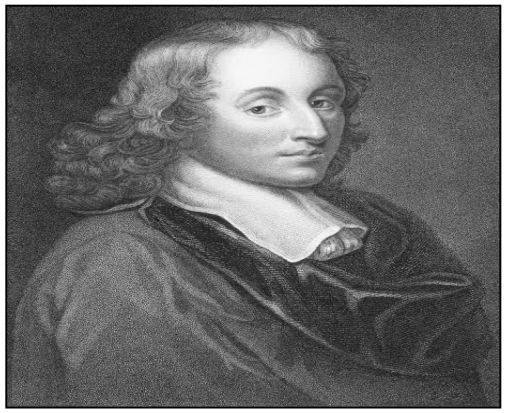
১৬৩২ সালে উইলিয়াম অডরেট (William Oughtred) নামের একজন ইংরেজ গণিতবিদ নেপিয়ারের লগারিদম ব্যবহার করে স্লাইড রুল আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে আইজ্যাক নিউটন ও অ্যামিদি মেন হেইম এর উন্নতি সাধন করেন।



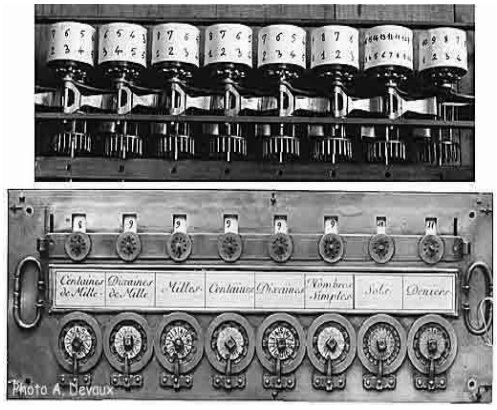
চিত্র ১.১.৫ : স্লাইড রুল

যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর
Electronics Calculator

১৬৪২ সালে ১৯ বছর বয়সে ফরাসি গণিতবিদ ব্লেইজ প্যাসকেল (Blaise Pascal) গিয়ার ও চাকতি ব্যবহার করে সর্বপ্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর বা যান্ত্রিক গণনা যন্ত্র আবিষ্কার করেন যার নাম প্যাসকেলেন (Pascalene)। প্যাসকেলের যন্ত্রের সাহায্যে যোগ ও বিয়োগ করা যেত। তিনি পুনঃপুনঃ যোগ ও বিয়োগের মাধ্যমে যথাক্রমে গুণ এবং ভাগ করার পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন।



চিত্র ১.১.৬ : ব্লেইজ প্যাসকেল



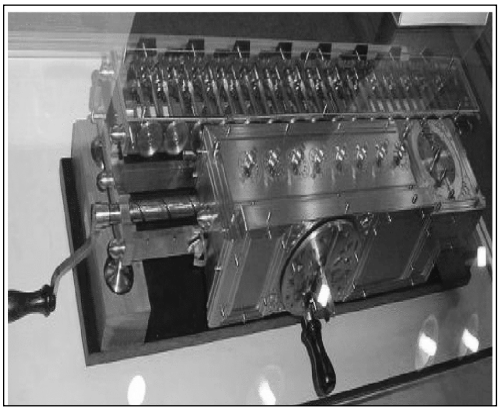
চিত্র ১.১.৭ : প্যাসকেলের যন্ত্র

রিকোনির যন্ত্র
Rechoning Machine

১৬৭১ সালে জার্মান দার্শনিক ও গণিতবিদ গটফ্রাইড ভন লিবনিজ (Gottfried Von Leibniz) প্যাসকেলের যন্ত্রের ভিত্তিতে চাকা ও দণ্ড ব্যবহার করে আরো উন্নত যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। তিনি যন্ত্রটির নাম দেন রিকোনির যন্ত্র (Rechoning Machine)। এটির সাহায্যে গুণ, ভাগসহ হিসাবের অন্যান্য বিষয় আরো সহজ হয়ে যায়। মূলত রিকোনির যন্ত্রটিই ছিল বাণিজ্যিক ক্যালকুলেটর। যন্ত্রটির যান্ত্রিক অসুবিধার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। তবে পরে ১৮২০ সালে টমাস ডি কোমার (Thomas De Colmar) রিকোনিং যন্ত্রের যান্ত্রিক অসুবিধা দূর করে লিবনিজের যন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলেন।



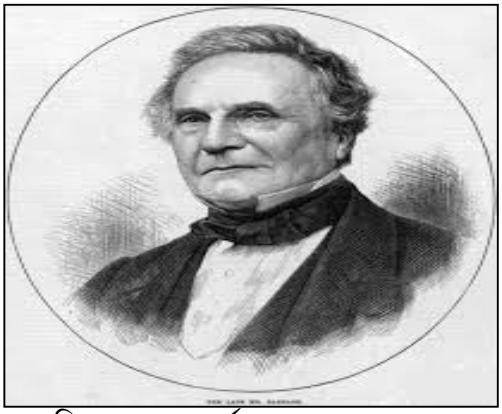
চিত্র ১.১.৮ : গটফ্রাইড ভন লিবনিজ



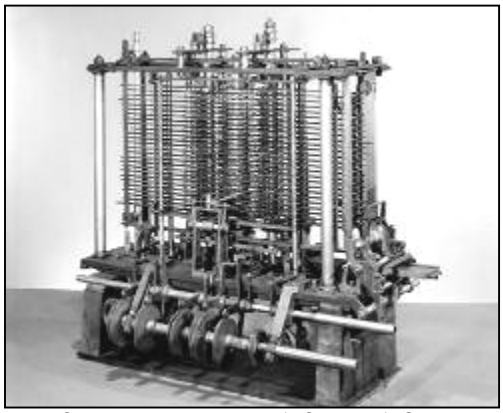
চিত্র ১.১.৯ : রিকোনির যন্ত্র

ডিফারেন্স ইঞ্জিন
Differenc Engine

১৭৮৬ সালে জার্মানির মুলার 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন' নামে পরিচিত একটি ক্যালকুলেটর বা গণনা যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেন। এর প্রায় দুই যুগ পর ১৮১২ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ (Charls Babbage) আরো উন্নত ডিফারেন্স ইঞ্জিন (Differenc Engine) বা বিয়োগ ফলভিত্তিক গণনার যন্ত্র উদ্ভাবনের পরিকল্পনা করেন। চার্লস ব্যাবেজ ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, দার্শনিক, আবিষ্কারক এবং যন্ত্র প্রকৌশলী। তাঁকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়। ১৮১৩ সালে তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিনকে উন্নত করার জন্য রয়েল সোসাইটি থেকে অনুদান পান। কিন্তু সেই সময়ে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে মেশিনটি তৈরিতে বিঘ্ন ঘটে এবং রয়েল সোসাইটি অনুদান বন্ধ করে দেন।



চিত্র ১.১.১০ : চার্লস ব্যাবেজ



চিত্র ১.১.১১ : অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন

১৮৩৩ সালে ব্যাবেজ 'অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন' নামে অপর একটি যন্ত্র তৈরি করার পরিকল্পনা করেন এবং নকশা তৈরি করেন। ব্যাবেজ আধুনিক কম্পিউটারের মতোই তাঁর মেশিনে নিয়ন্ত্রণ অংশ, গাণিতিক অংশ, স্মৃতি অংশ, গ্রহণ মুখ, নির্গমন

মুখ চিহ্নিত করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী মেশিনটিতে পঞ্চাশ অঙ্ক দৈর্ঘ্যের এক হাজার সংখ্যা সংরক্ষণ ছাড়াও পঞ্চাশ অংক দৈর্ঘ্যের দুটি সংখ্যার যোগ বা বিয়োগের জন্য এক সেকেন্ড এবং গুণের জন্য এক মিনিট সময় লাগার কথা ছিল। এমনকি কার্ডের মাধ্যমে তথ্য ধরে রাখার কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কারিগরি অনগ্রসরতার কারণে এ যন্ত্রের বাস্তব রূপ দিয়ে যেতে পারেনি। তবুও তাঁর চিন্তা-ভাবনাই পরবর্তীতে কম্পিউটার উন্নয়নে সাহায্যে করে। তাই চালর্স ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিনের পরিকল্পনা ও উন্নয়নে ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের কন্যা অগাস্টা এডা বায়রনের (Augusta Ada Byron) অবদান অনস্বীকার্য। এ যন্ত্রে সাধারণ অ্যাসেম্বলি ভাষার মতোই প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হতো। এডা লাভল্যাচ অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিনের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এডা লাভল্যাচই (Ada Lavelace) পৃথিবীর সর্বপ্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার। আধুনিক প্রোগ্রামিং ভাষা এডা তাঁর নামানুসারেই রাখা হয়।

পাঞ্চ কার্ড

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বস্ত্র বুনন ছিল ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। সে সময় ফরাসি দেশীয় জেমস মেরি জেকার্ড (১৭৫২-১৮৩৪ খ্রি.) কাপড় বুননের জন্য ছিদ্রযুক্ত কার্ড বা পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করেন। তিনি সুচতুর উপায়ে কার্ডের ছিদ্র দিয়ে সুতা নিয়ন্ত্রণ করে কাপড়ে অনেক নকশা তৈরি করতে সক্ষম হন। এর পর যুক্তরাষ্ট্রের ড. হলিরিথ মেশিনের সাথে সংযোগের জন্য সফলভাবে কার্ড ব্যবহার করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে পাঞ্চ কার্ড কম্পিউটারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে ওঠে। এ শতাব্দীর সত্তর পর্যন্ত উপাত্ত সংরক্ষণ ও কম্পিউটারের সাথে সংযোগের জন্য পাঞ্চ কার্ডেরও বহুল প্রচলন ছিল।

টেবুলেটিং মেশিন
Tabulating Machine

১৮৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড. হারম্যান হলিরিথ (Dr. Herman Hollerith) নামের একজন পরিসংখ্যানবিদ সেন্সাস মেশিন বা টেবুলেটিং মেশিন নামে একটি গণনা যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রে তিনি পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করে ১৮৯০ সালের শুমারি মাত্র তিন বছরে শেষ করেন। অথচ এ ধরনের মেশিন ছাড়া ১৮৮০ সালের শুমারি করতে সময় লেগেছিল দশ বছর। সেন্সাস মেশিন ব্যবহার করে অনেক দিন পর্যন্ত ডেটা সংরক্ষণ করা যেত।



চিত্র ১.১.১২ : ড. হারম্যান হলিরিথ

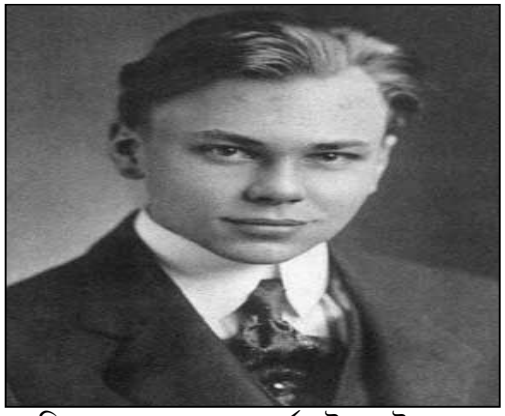


চিত্র ১.১.১৩ : টেবুলেটিং মেশিন

ড. হলিরিথ ১৮৯৬ সালে 'টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি' নাম দিয়ে একটি ব্যবসায়ীপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে তাঁর কোম্পানি আরো কয়েকটা কোম্পানির সঙ্গে একীভূত হয়ে IBM (International Business Machine) কোম্পানি গঠিত হয়। টেবুলেটিং মেশিন উদ্ভাবিত হওয়ার পর হতেই ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল টেকনিক ব্যবহার করে কম্পিউটার তৈরির যুগ শুরু হয়।

ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কম্পিউটার
Electro-Machenical Computer

যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত কম্পিউটারকে ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কম্পিউটার বলা হয়। ১৯৩৭ সালে আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ড. হাওয়ার্ড এইচ আইকেন (Dr. Howard Aeiken) ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল টেকনিক ব্যবহার করে চার্লস ব্যাবেজের অ্যানালাইটিক ইঞ্জিনের মতো একটি যন্ত্র তৈরি করার পরিকল্পনা করেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। ১৯৪৪ সালে হাওয়ার্ড মার্ক-১ (Mark-I) নামের পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কম্পিউটার তৈরি করেন। মার্ক-১ ছিল হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ও আইবিএম কোম্পানির যৌথ উদ্যোগের একটি ফসল।



চিত্র ১.১.১৪ : ড. হাওয়ার্ড এইচ আইকেন



চিত্র ১.১.১৫ : মার্ক-১ (Mark-1)

মার্ক-১ (Mark-1)-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১. মার্ক-১ দৈর্ঘ্য ছিল ৫১ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ৮ ফুট।
২. ওজন ছিল প্রায় ৫ টন।
৩. সাত লক্ষেরও অধিক যন্ত্র সংযোগের জন্য প্রায় ৫০০ মাইল লম্বা তার ব্যবহার করা হয়েছিল।
৪. গিয়ার ও চাকার পরিবর্তে চৌম্বক রিলে ব্যবহৃত হয়।
৫. মার্ক-১-এর সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ছাড়াও অনেক জটিল গাণিতিক কাজ করা যেত।
৬. মার্ক-১ দ্বারা দু'টি সংখ্যার যোগ ও গুণ করতে যথাক্রমে ০.৩ ও ৪.৫ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হতো।

মার্ক-১ কম্পিউটারটি ১৫ বছর চালু ছিল। প্রদর্শনের জন্য এটি বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

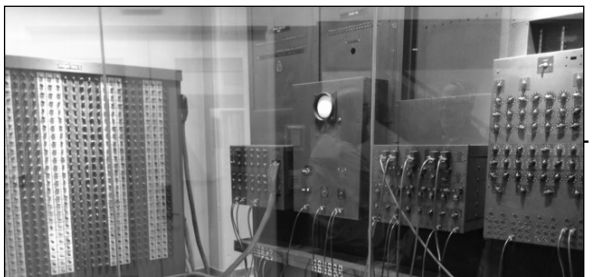
ইলেকট্রনিকস কম্পিউটার

Electro Computer

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. জন ভিনসেন্ট অ্যাটানসাফ (Dr. John vincent Atanasoff) এবং তাঁর ছাত্র ক্লিফ (Cliff Barry) ১৯৩৯ সালে যৌথভাবে ভ্যাকুম টিউব ব্যবহার একটি ইলেকট্রনিক গণনাকারী যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাঁদের নামানুসারে যন্ত্রটির নামকরণ করা হয় এবিসি (ABC-Atanasof Barry Computer)। এটিই ছিল প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এটির গাণিতিক/যুক্তিমূলক কাজের জন্য ৪৫টি ভ্যাকুয়াম টিউব এবং তথ্য সংরক্ষণের জন্য মেমরি হিসেবে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জন মউসলি (Dr. John Manchly) এবিসি কম্পিউটার দেখে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪৬ সালে ড. জন মউসলি এবং তাঁর ছাত্র প্রেসপার একার্ট (Presper Eckert) যৌথভাবে ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) নামক কম্পিউটারটি তৈরি করেছিলেন। এটিই হলো প্রথম প্রজন্মের ডিজিটাল কম্পিউটার।





চিত্র ১.১.১৬ : ENIAC কম্পিউটার

ENIAC-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১. এটি ৩০ টন এবং ১৯ হাজার ইলেকট্রনিক টিউব দিয়ে নির্মিত।
২. এটি চালানোর জন্য ১৩০ হতে ১৪০ কিলোওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো।
৩. প্রতি সেকেন্ডে ৫ হাজারটি যোগ এবং ৫ শতটি গুণ করতে পারত।
৪. দশ অংকের দুটি সংখ্যা গুণ করতে তিন মিলি সেকেন্ড সময় লাগত।
৫. প্রোগ্রামের জন্য এ কম্পিউটারের তারযুক্ত প্লাগবোর্ড ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান (John Van Neuman) কম্পিউটার যন্ত্রের জন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার এবং যন্ত্রের অভ্যন্তরেই উপাত্ত ও নির্বাহ সংকেত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এ ধারণা সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নামে খ্যাত। ১৮৪৮ সালে আইবিএম SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator) নামক একটি কম্পিউটার তৈরি করেন, যার মেমরিতে প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যেত। আর এটিই ছিল প্রথম কম্পিউটার, যার মধ্যে স্মৃতিতে প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করা যেত।

ভন নিউম্যানের তত্ত্বকে ব্যবহার করে ১৯৪৬ সালের মধ্যে ড. জন মউসলি এবং তাঁর ছাত্র প্রেসপার একার্ট EDVAC (Electronic Descrete Variable Automatic Computer) নামে অপর একটি কম্পিউটার তৈরি করেন। এটির সাহায্যে একটি যোগ করতে ১.৫ মিলি সেকেন্ড এবং একটি গুণ করতে ৪ মিলি সেকেন্ড সময় লাগত। আবার এটিতে সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নির্বাহের কিছু সুবিধা ছিল।

এনিয়াক (ENIAC) কম্পিউটারের প্রোগ্রামের জন্য তারযুক্ত প্লাগবোর্ড ব্যবহার করা হতো। প্রোগ্রামিংয়ের জন্য তারের সংযোগ বদলানোর প্রয়োজন হতো এবং শত শত সংযোগ বদলানোর জন্য কয়েক দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেত। এ ধরনের অসুবিধার দূর করার লক্ষ্যে আমেরিকায় এডভ্যাক (EDVAC) তৈরির সময়েই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক মার্কস উইলকিসের নেতৃত্বাধীন একদল বিজ্ঞানী EDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Calcualtor) নামক কম্পিউটারটি তৈরি করেন। প্রকৃতপক্ষে এডস্যাক (EDSAC) কম্পিউটারই প্রথম সংরক্ষিত প্রোগ্রামবিশিষ্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। আবার অনেকেই এডস্যাক (EDSAC) কম্পিউটারকে প্রথম স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল কম্পিউটার মনে করেন।

১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্টর (Transistor) আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কম্পিউটার ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ট্রানজিস্টর আকারে অনেক ছোট এবং এতে কম বিদ্যুৎ খরচ হয় বিধায় ট্রানজিস্টর দিয়ে কম্পিউটারগুলো আকারে অনেক ছোট, গরম কম হয়, কর্মদক্ষতা অনেক বেশি, অধিক নির্ভরযোগ্য ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। ১৯৫১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে হোয়ার্লউইন্ড-১ কম্পিউটার নির্মাণের কাজ শেষ হয়। একই বছরে ENIAC-এর নির্মাতারা UNIVAC (Universal Automatic Computer) কম্পিউটারের নির্মাণকাজ শেষ করেন। ইউনিভ্যাকই ছিল

সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এবং এ যন্ত্রেই সর্বপ্রথম চুম্বক-ফিতা ব্যবহার করা হয়েছিল। UNIVAC কম্পিউটারে একই সঙ্গে পড়া, গণনা ও তথ্য লেখার কাজ করা যেত।



চিত্র ১.১.১৭ : UNIVAC কম্পিউটার

ইউনিভ্যাকের সময় হতেই বিভিন্ন কোম্পানি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কম্পিউটার তৈরি শুরু করে। এদের মধ্যে IBM ছিল অগ্রগামী। ১৯৫২ সালে টমাস ওয়াটসন (Thomas Watson) IBM-701 এবং ১৯৫৩ সালে IBM-650 কম্পিউটার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি করেন।

ইলেকট্রনিকসের দ্রুত উন্নতির সাথে সাথে কম্পিউটারের অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কম্পিউটার তৈরিতে বড় ধরনের বিপ্লব পরিলক্ষিত হয় ১৯৭১ সালে IC (Integrated Circuit) এবং LSI (Large Scale Integration) বর্তনীর সাহায্যে নির্মিত মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় কম্পিউটারের বহুমূখী ব্যবহার এবং তৈরি হতে শুরু হয় পার্সোনাল কম্পিউটার। মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের আকার আরো ছোট হয়ে যায়, দাম কমে যায় এবং বিদ্যুৎ খরচ কমে যায়। ফলে কাজ করার ক্ষমতা, কাজের গতি ও নির্ভরশীলতা বহুগুণে বেড়ে যায়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেল কোম্পানি ১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কার করে।

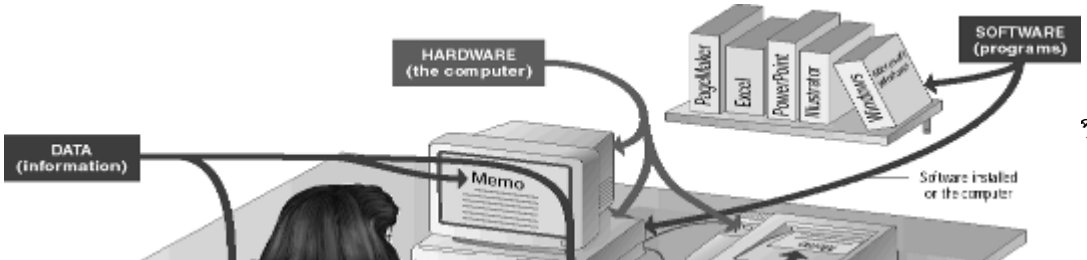
এভাবে সময়ের বিবর্তনে প্রযুক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে সব ডিজিটাল কম্পিউটার আবির্ভূত হচ্ছে এবং ভূমিকা ও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। মূলত পরবর্তীকালে কম্পিউটারের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মাইক্রোপ্রসেসরের ইতিহাসকে অনুসরণ করে।

কম্পিউটার সিস্টেম

Computer System

কম্পিউটার কতগুলো উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি। এ ধরনের উপাদানগুলো একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এই উপাদানসমূহের একত্রে গঠিত সিস্টেমই হলো কম্পিউটার সিস্টেম। কম্পিউটার সিস্টেমের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ–

(১) হার্ডওয়্যার (Hardware)
(২) সফটওয়্যার (Software)
(৩) ফার্মওয়্যার (Frimware)
(৪) ডেটা (Data)
(৫) হিউম্যানওয়্যার (Humanware)/ব্যবহারকারি(User)



চিত্র ১.১.১৮ : কম্পিউটার সিস্টেম

হার্ডওয়্যার (Hardware) : কম্পিউটার সিস্টেম পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত, যা ব্যবহারকারী প্রদত্ত কোনো প্রোগ্রামের নির্দেশাবলি পালন করে এবং ফলাফল প্রদান করে। কম্পিউটারব্যবস্থায় হার্ডওয়্যার অন্যতম উপাদান। কম্পিউটার তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বা যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশসমূহকে বলা হয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার। সাধারণত কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে আমরা দেখতে পারি এবং স্পর্শ করতে পারি। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর, মাদারবোর্ড প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সহায়তা করার জন্য রয়েছে অন্য ডিভাইসসমূহ যেমন–ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, কি-বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি। উল্লিখিত সকল যন্ত্রপাতিই কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার।

সফটওয়্যার (Software) : কম্পিউটার হচ্ছে একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা মূলত ডেটা গ্রহণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং ফলাফল প্রদান করে। কম্পিউটারের নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই বা নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কাজ করতে পারে না। কম্পিউটার কাজ করে ব্যবহারকারী প্রদত্ত নির্দেশ বা নির্দেশাবলি অনুযায়ী। এ ধরনের নির্দেশাবলির সমষ্টিই হলো সফটওয়্যার, যা সম্পন্ন কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। অর্থাৎ সফটওয়্যার হলো কতকগুলো প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি, যা হার্ডওয়্যারকে কর্মক্ষম করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদান করে। হার্ডওয়্যার সত্যিকার অর্থে কম্পিউটিং কাজ করে এবং সফটওয়্যার কম্পিউটার পরিচালনা করে। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সফটওয়্যারকে স্পর্শ করা যায় না তবে মানুষের ব্রেইনের সাথে তুলনা করা যায়। DOS, Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Vedio Player, Pagemaker ইত্যাদি সফটওয়্যারের উদাহরণ।

ফার্মওয়্যার (Farmware) : সাধারণত কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করার সময় কম্পিউটারের মেমরিতে যে সকল প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেয়া হয় তাকে ফার্মওয়্যার বলে। এ সকল প্রোগ্রাম কম্পিউটার ব্যবহারকারী পরিবর্তন করতে পারে না। ROM BIOS-এর মধ্যে যে ডেটা এবং নির্দেশগুলো থাকে তা হলো ফার্মওয়্যার।

হিউম্যানওয়্যার (Humanware) : কম্পিউটারকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। ডেটা সংগ্রহ, প্রোগ্রাম বা ডেটা সংরক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ, কম্পিউটার চালনা, প্রোগ্রাম লেখা, সিস্টেমগুলো ডিজাইন ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজগুলোর সাথে যুক্ত সমস্ত মানুষকে একসাথে হিউম্যানওয়্যার বলে। একজন কম্পিউটারের ব্যবহারকারী (হিউম্যানওয়্যার) প্রথমত ডেটা সংগ্রহ করেন। কম্পিউটার প্রসেস করার জন্য কম্পিউটারের সিস্টেম ডিজাইন করেন এবং কম্পিউটারের প্রোগ্রাম লেখেন। এরপর কম্পিউটার ব্যবহারকারী কম্পিউটার চালনার মাধ্যমে প্রোগ্রামটিকে চালিয়ে দেখেন এবং ডেটাগুলোকে পরীক্ষা করেন। এ সব কাজই হিউম্যানওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীর নিকট আনা ও সেট আপ করে দেয়ার জন্য যে সব কাজে মানুষ যুক্ত তারাও হিউম্যানওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত।

ডেটা (Data) : সাধারণত প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত অসংঘবদ্ধ তথ্যকে বলা হয় ডেটা। কম্পিউটারনির্ভর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, কোনো বিষয়ে ধারণা বা অবস্থার বর্ণনা বা চিত্র ইত্যাদিকে ডেটা বলে। ডেটার বিভিন্ন ধরন হচ্ছে : টেক্সট, গ্রাফিক্স , চিত্র, অডিও, ভয়েস ইত্যাদি। ডেটা সাধারণত এলোমেলো অবস্থায় থাকে। যেমন– একজন ছাত্রের নাম, রোল, ঠিকানা, প্রাপ্ত নম্বর ইত্যাদি হচ্ছে একেকটি ডেটা।

সারসংক্ষেপ :

কম্পিউটার আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার ফলাফল, রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের অবদান। বিবর্তনের অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে কম্পিউটার বর্তমান অবস্থায় এসেছে। কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যার নিজস্ব কোনো উদ্ভাবনী শক্তি বা চিন্তা নেই। অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সঙ্গে কম্পিউটারের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে বহুমুখিতা। সাধারণত একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে এক ধরনের কাজেই করা যায়। যেমন– টেলিভিশনের সাহায্যে শুধু গান-বাজনা শোনা এবং ছবি দেখা যায়। কিন্তু একটি কম্পিউটারের সাহায্যে টাইপরাইটারের কাজ করা যায়, ছবি আঁকা যায়, হিসাব-নিকাশ করা যায়, গান শোনা যায়, টেলিভিশন দেখা যায় এবং আরো বহু কাজ করা যায়। এজন্য কম্পিউটারকে বহুমুখি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাঠ-১.২ কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম

Evolution and Generations of Computer

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- কম্পিউটারের প্রজন্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রজন্ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কম্পিউটারের প্রজন্ম

Generations of Computer

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের ক্রমবিবর্তন বলতে মূলত কম্পিউটারের প্রজন্ম বা জেনারেশনকেই বোঝায়। কম্পিউটার জেনারেশন বা প্রজন্ম বলতে এর প্রযুক্তিগত বিবর্তনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কম্পিউটারশিল্পের ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি নির্মাণ কাঠামোরূপে কাজ করে। বিবর্তনের অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে কম্পিউটার বর্তমান অবস্থায় এসেছে। কম্পিউটারের পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি পর্যায় বা ধাপকে বলা হয় কম্পিউটার প্রজন্ম। অর্থাৎ কম্পিউটারের বিবর্তনের ইতিহাসকে কম্পিউটার যন্ত্রের ক্রমপরিবর্তন, ক্রম উন্নয়ন এবং বিকাশের পর্যায় অনুসারে যে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়, এর একেকটি ধাপকে বলা হয় কম্পিউটার জেনারেশন বা প্রজন্মকাল। প্রতিটি প্রজন্মে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের প্রয়োগের ভিত্তিতে কম্পিউটারকে পাঁচটি প্রজন্ম বা জেনারেশনে ভাগ করা হয়। ভাগগুলো হলো–

১. প্রথম প্রজন্ম বা জেনারেশন (First Generation)
২. দ্বিতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন (Second Generation)
৩. তৃতীয় প্রজন্ম বা জেনারেশন (Third Generation)
৪. চতুর্থ প্রজন্ম বা জেনারেশন (Forth Generation) ও
৫. পঞ্চম প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম (Fifth Generation)

প্রথম প্রজন্ম

First Generation

১৯৪২ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সময়কালকে কম্পিউটারের প্রথম প্রজন্ম বলে ধরা হয়। এ প্রজন্মের কম্পিউটারের সার্কিটে ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হতো। অসংখ্য ডায়োড, ট্রায়োড, ভালভ, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হতো বলে প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার ছিল আকৃতিতে বড় এবং স্বল্প গতিসম্পন্ন।



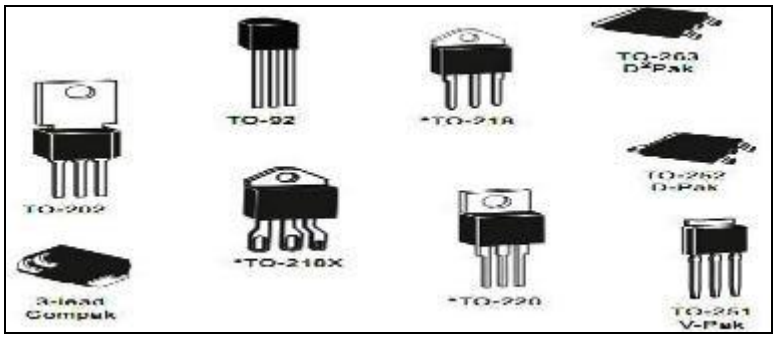
চিত্র ১.২.১ : ভ্যাকুয়াম টিউব বা বায়ুশূন্য টিউব

প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে বিদ্যুৎ খরচ বেশি হতো এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হতো। চালু অবস্থায় কম্পিউটার ঠাণ্ডা রাখতে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা হতো। আকৃতিতে বড় থাকার কারণে সহজে বহনযোগ্য ছিল না। প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে পাঞ্চ কার্ডের মাধ্যমে ইনপুট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এসব কম্পিউটারের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। এ প্রজন্মের কম্পিউটারে প্রোগ্রামের জন্য মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষা ব্যবহার করা হতো। UNIVAC, ENIAC, EDSAC, IBM 650, IBM 704, Mark I, Mark IV ইত্যাদি প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের উদাহরণ। এ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১। বায়ুশূন্য টিউবের ব্যবহার।
২। আকারে অনেক বড়।
৩। সীমিত তথ্য ধারণক্ষমতা।
৪। মেশিন ভাষার (০/১) মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান।
৫। ইনপুট-আউটপুট ব্যবস্থার জন্য পাঞ্চ কার্ডের ব্যবহার।
৬। সহজে স্থানান্তর যোগ্য ছিল না।
৭। অত্যধিক বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন।
৮। অনুন্নত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা; ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রজন্ম
Second Generation

১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময় কালকে কম্পিউটারের দ্বিতীয় প্রজন্ম বলে ধরা হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলোতে ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছিল। টিউবের তুলনায় ট্রানজিস্টর আকারে ছোট, বিদ্যুৎ খরচ কম, দামে সস্তা এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়ায় দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো আকৃতিতে ছোট, দ্রুতগতি ও অধিক নির্ভরযোগ্য ছিল।



চিত্র ১.২.২ : ট্রানজিস্টর

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করলেও স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। এ প্রজন্মের কম্পিউটারে সর্বপ্রথম হাইলেভেল ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। আবার চুম্বকীয় কোর মেমরি এবং উচ্চগতিসম্পন্ন ইনপুট-আউটপুট ব্যবস্থাও এ প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। IBM 1401, CDC 1604, RCA 301, RCA 501, BCR 300, GE 200, Honey well 200, 1600 IBM 1620 ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের উদাহরণ। ১৯৬৪ সালে এ প্রজন্মের IBM 1620 কম্পিউটার দিয়ে বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। ঢাকা পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে সুদীর্ঘ কয়েক বছর চালু ছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মে কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১। ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার।
২। ম্যাগনেটিক কোর মেমরির ব্যবহার।
৩। আকৃতির সংকোচন ও অধিক নির্ভরযোগ্যতা।

৪। উচ্চগতিসম্পন্ন ও উন্নতমানের ইনপুট-আউটপুট ব্যবস্থার প্রচলন।

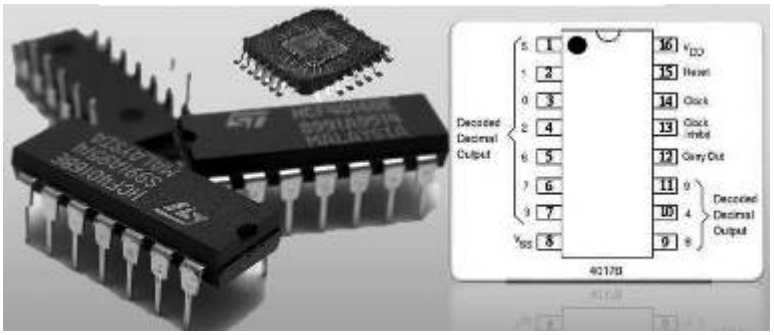
৫। অপেক্ষাকৃত বেশি তথ্য ধারণক্ষমতা।

৬। উচ্চস্তরের ভাষার ব্যবহার (যেমন– COBOL, FORTRAN)।

৭। টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা; ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রজন্ম
Third Generation

তৃতীয় প্রজন্মের ব্যাপ্তিকাল ১৯৬৫ হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৮ সালে রবার্ট নইসি (Robert Noyce) এবং জ্যাক কিলবি (Jack Kilby) IC (Integrated Circuit) আবিষ্কার করে ইলেকট্রনিক জগতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। মাইক্রোইলেকট্রনিকসের অগ্রযাত্রা মূলত তখন থেকে শুরু হয়। একটি মাত্র IC-তে অনেকগুলো ট্রানজিস্টর, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর এবং অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে একটি ক্ষুদ্র সিলিকন পাতের ওপর স্থাপন করা থাকে। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো IC ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল। ফলে কম্পিউটারের আকার আরো ছোট হয়ে আসে, দাম কমে যায়, বিদ্যুৎ খরচ কমে যায়, কাজের গতি ও নির্ভরশীলতা বহুগুণে বেড়ে যায়। একই সাথে কম্পিউটারের মেমরিব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে।



চিত্র ১.২.৩ : IC (Integrated Circuit)

দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকেই কম্পিউটারের সাথে ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট (যেমন–মনিটর), উচ্চগতির লাইন প্রিন্টারসহ অন্যান্য পেরিফেরাস ডিভাইসের ব্যবহার শুরু হয়। তবে এ প্রজন্মে কম্পিউটারে একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ৫ ন্যানো সেকেন্ড সময় লাগত। IBM 360, 370, PDP 8, PDP II ইত্যাদি তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১। কম্পিউটার তৈরিতে একীভূত বর্তনী (IC)-এর ব্যবহার।

২। অর্ধপরিবাহী স্মৃতির উদ্ভব ও বিকাশ।

৩। আকৃতি ছোট, কম দাম এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪। মুদ্রণের জন্য লাইন প্রিন্টারের ব্যবহার।

৫। আউটপুট হিসেবে মনিটরের ব্যবহার।

৬। অপারেটিং সিস্টেম ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৭। সহজে স্থানান্তরযোগ্য।

৮। রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম, মাল্টিপ্রোগ্রামিং পদ্ধতি, টাইম শেয়ারিং, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির ব্যবহার।

৯। যান্ত্রিক গোলযোগ কম বলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম; ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রজন্ম

Forth Generation

১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চতুর্থ প্রজন্ম শুরু হয়েছে বলে ধরা হয়। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে IC (Integrated Circuit)-এর দ্রুত উন্নয়নের ফলে LSI (Large Scale Integration) এবং VLSI (Very Large Scale Integration) চিপের আবির্ভাব ঘটে। একটি একক VLSI সিলিকন চিপের মধ্যে এক মিলিয়নেরও অধিক ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি একীভূত থাকে। কম্পিউটার তৈরিতে বড় ধরনের বিপ্লব পরিলক্ষিত হয় ১৯৭১ সালে IC এবং VLSI বর্তনীর সাহায্যে নির্মিত মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। মূলত মাইক্রোপ্রসেসর হলো সিলিকনের তৈরি এক ধরনের VLSI চিপ।



চিত্র ১.২.৪ : মাইক্রোপ্রসেসর

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করে তৈরি করা হতো। মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের আকার আরো ছোট হয়ে যায়, দাম কমে যায় এবং বিদ্যুৎ খরচ কমে যায়। ফলে কাজ করার ক্ষমতা, কাজের গতি ও নির্ভরশীলতা বহুগুণে বেড়ে যায়। সাথে সাথে মেমরিও উন্নতি ঘটে ব্যাপক ফলে শুরু হয়ে যায় কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহার এবং তৈরি হতে শুরু হয় পার্সোনাল কম্পিউটার। Windows, DOS অপারেটিং সিস্টেম দুটির ব্যবহার এ প্রজন্ম থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৮১ সালে IBM কোম্পানি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রথম মাইক্রোকম্পিউটার তৈরি করা শুরু করে। IBM -3033, IBM -4341, TRS -40, Pentium Series, IBM পিসি ইত্যাদি এ প্রজন্মের কম্পিউটার। এ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Intelligence) ব্যবহার।
২। বহু মাইক্রোপ্রসেসর এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশবিশিষ্ট একীভূত বর্তনীর ব্যবহার।
৩। বর্তনীগুলোতে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার।
৪। উন্নত মেমরির তথা ম্যাগনেটিক বাবল মেমরির ব্যবহার।
৫। মানুষের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশের অনুধাবন।
৬। তথ্য ধারণক্ষমতার ব্যাপক উন্নয়ন।
৭। অত্যন্ত শক্তিশালী ও উচ্চগতিসম্পন্ন মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার।
৮। সুপার কম্পিউটারের উন্নয়ন।
৯। প্যাকেজ প্রোগ্রামের প্রচলন।
১০। ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার নেটওয়ার্কব্যবস্থা চালু; ইত্যাদি।

পঞ্চম প্রজন্ম

Fifth Generation

সাধারণত ২০০১ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের কম্পিউটারগুলোকে পঞ্চম প্রজন্মে কম্পিউটার বিবেচনা করা হয়। মূলত পঞ্চম প্রজন্ম বলতে প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেই বোঝায়। এ প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো মানুষের ভাষায় কথা বলা ও মানুষের কথা বুঝতে পারার ক্ষমতাও থাকবে। অর্থাৎ এগুলো হবে বুদ্ধিমান কম্পিউটার।

পঞ্চম প্রজন্ম VLSI প্রযুক্তিকে অতিক্রম করে UVLSI (Ultra Very Large Scale Integration) প্রযুক্তিতে অবস্থান করবে। ফলে ১০ মিলিয়নের অধিক বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কম্পোনেটকে একটি সিঙ্গেল চিপের মধ্যে আনা সম্ভব হবে। এ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ হবে নিম্নরূপ–

১. বহু মাইক্রোপ্রসেসর বিশিষ্ট একীভূত বর্তনীর ব্যবহার।
২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন।
৩. স্বয়ংক্রিয় অনুবাদক ও শ্রবণযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ ও পরিচালনা।
৪. প্রোগ্রামসামগ্রীর ব্যাপক উন্নতি।
৫. তথ্য ধারণক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
৬. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যাপক ক্রমোন্নতি।
৭. অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেটব্যবস্থা।
৮. বিপুল শক্তিসম্পন্ন সুপার কম্পিউটারের উন্নয়ন; ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ:

কম্পিউটার ক্রমবিবর্তন কথাটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কম্পিউটারের ক্রমবিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং উন্নয়নকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ধাপকে কম্পিউটারের জেনারেশন বা প্রজন্ম বলা হয়। একটি প্রজন্ম থেকে আরেকটি প্রজন্মের পরিবর্তনের সময় পূর্ববর্তী প্রজন্মের সমস্যাগুলোর সমাধান করে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে একেকটি প্রজন্মের আত্মপ্রকাশ ঘটানো হয়। তবে নতুন বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি পুরনো বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে যায়। পরবর্তীতে পুরনো বৈশিষ্ট্যগুলোও প্রযুক্তিগত বিবর্তনের ধারায় উঠে যায় এবং সৃষ্টি হয় নতুন কোনো প্রজন্মের। তবে ডায়োড, ভালভ, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, আইসি, মাইক্রোপ্রসেসর ইত্যাদি কম্পিউটার প্রজন্মের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাঠ-১.৩ কম্পিউটারের প্রকারভেদ
Classification of Computer

উদ্দেশ্য

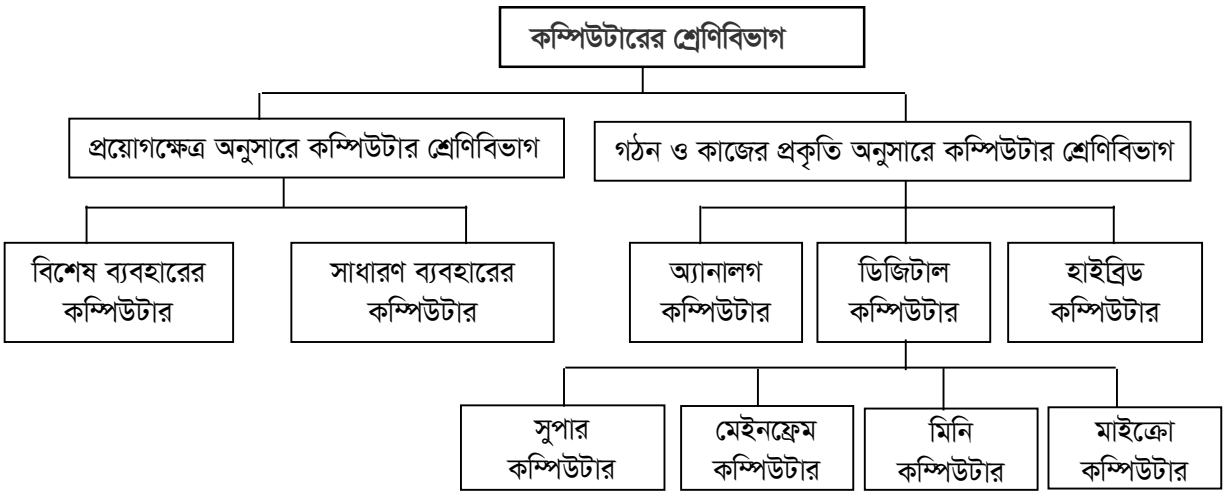
এ পাঠ শেষে আপনি

- কাজের ধরন ও ব্যবহারের প্রয়োগক্ষেত্র অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন; এবং
- আকার, আকৃতি, ক্ষমতা ও কার্যকারিতা অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Computer

বর্তমান বিশ্বে ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যথা–

১. কাজের ধরন ও ব্যবহারের প্রয়োগক্ষেত্র অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ
২. গঠন ও কাজের প্রকৃতির অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ এবং
৩. আকার, আকৃতি, আয়তন ও কার্যকারিতা অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ



চিত্র ১.৩.১ : কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

কাজের ধরন ও ব্যবহারের প্রয়োগক্ষেত্র অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

কাজের ধরন ও ব্যবহারের প্রয়োগক্ষেত্র অনুসারে কম্পিউটারকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন–

১। সাধারণ ব্যবহারের কম্পিউটার (Genereal Purpose Computer) ও
২। বিশেষ ব্যবহারের কম্পিউটার (Special Purpose Computer)

সাধারণ ব্যবহারের কম্পিউটার
Genereal Purpose Computer

সাধারণত যে সমস্ত কম্পিউটার দ্বারা বহুমুখী কাজ করা যায় সে সমস্ত কম্পিউটারকে বহুমুখী ব্যবহারের কম্পিউটার বলা হয়। বর্তমানে প্রচলিত মাইক্রোকম্পিউটার থেকে শুরু করে সুপার কম্পিউটার পর্যন্ত সকল কম্পিউটারই বহুমুখী ব্যবহারের কম্পিউটার। এসব কম্পিউটারে ব্যবহারকারী ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নতুন প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে পারেন এবং প্রয়োজনে

পুরাতন প্রোগ্রাম মুছে ফেলতে পারেন কিংবা এক সঙ্গে একাধিক প্রোগ্রামের সাহায্যে বহুবিদ কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারেন। এ ধরনের কম্পিউটারের সাহায্যে একই সঙ্গে লেখালেখির কাজ, চিত্রাঙ্কন ও হিসাব-নিকাশের কাজ ছাড়া আরও অনেক রকমের কাজ করা যায়। অর্থাৎ এ ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহারকারী বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ যেমন– অফিস, আদালত, প্রকাশনা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কোম্পানি, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি কাজে সাধারণ কম্পিউটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

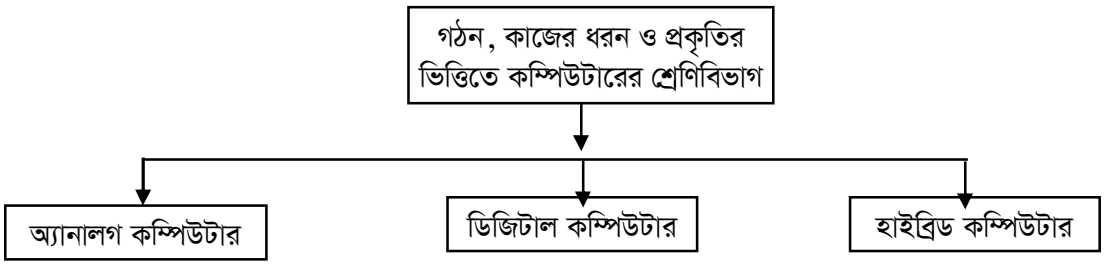
বিশেষ ব্যবহারের কম্পিউটার
Special Purpose Computer

যে কম্পিউটার বিশেষ ধরনের কাজ বা সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয়ে তাকে বিশেষ ব্যবহারের কম্পিউটার বলা হয়। এক ধরনের কাজের জন্য তৈরি এ ধরনের কম্পিউটার সাধারণত অন্য ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায় না। এ জন্য এ ধরনের কম্পিউটারগুলোকে বলা হয় বিশেষ ব্যবহারের কম্পিউটার। আবহাওয়া, ভূমিকম্প, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, আলট্রাসনোগ্রাফি, ভিডিও গেমস, রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণ, চক্ষু পরীক্ষা, মল-মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলোই হলো বিশেষ ধরনের কম্পিউটার। অবশ্য এ ধরনের কম্পিউটারে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম পূর্ব থেকেই স্থাপন করে দেয়া হয়।

গঠন ও কাজের প্রকৃতির অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

গঠন ও কাজের প্রকৃতি অনুসারে কম্পিউটারকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer)
২। ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer) ও
৩। হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)

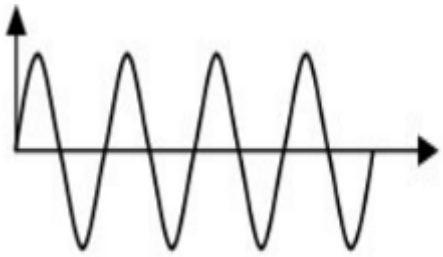


চিত্র ১.৩.২ : গঠন, কাজের ধরন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

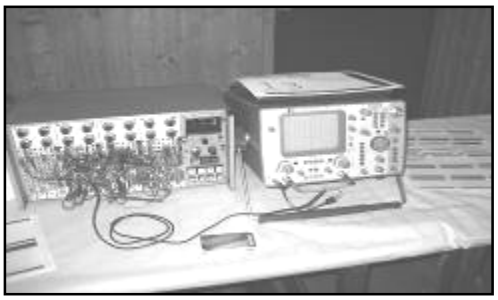
অ্যানালগ কম্পিউটার
Analog Computer

যে সকল কম্পিউটার বৈদ্যুতিক সংকেতের ওপর নির্ভর করে ইনপুট গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদিত করে, সেসব কম্পিউটারকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলা হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটারে বর্ণ বা অংকের পরিবর্তে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বা অ্যানালগ বৈদ্যুতিক সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মিটার, ওসিলোসকোপ ইত্যাদিতে প্রদর্শিত হয়। মোটরগাড়ির স্পিডোমিটার, স্লাইড রুল, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি অ্যানালগ কম্পিউটারের উদাহরণ।

সাধারণত চাপ, তাপ, তরল পদার্থের প্রবাহ ইত্যাদির উঠা-নামা বা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া গাড়ি, উড়োজাহাজ, মহাকাশ যান ইত্যাদির গতিবেগ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থের চাপ এবং কোনো বিশেষ স্থানের বা কক্ষের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। অ্যানালগ কম্পিউটারের ফলাফলের সূক্ষ্মতা তুলনামূলকভাবে কম।



চিত্র ১.৩.৩ : অ্যানালগ সিগন্যাল

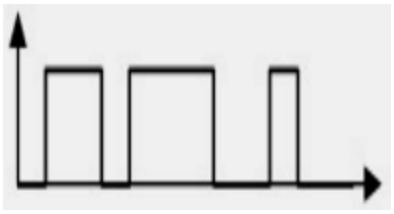


চিত্র ১.৩.৪ : অ্যানালগ কম্পিউটার

ডিজিটাল কম্পিউটার

Digital Computer

যে সকল কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতিতে অর্থাৎ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেসব কম্পিউটারকে ডিজিটাল, কম্পিউটার বলা হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের জন্য ডিজিটাল কম্পিউটার বৈদ্যুতিক সিগন্যালের পরিবর্তে ডিজিট (0/1) ব্যবহার করে। ডিজিটাল কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মনিটরে প্রদর্শিত হয়। ডিজিটাল কম্পিউটারের গতি ও কার্যকারিতা অ্যানালগ কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি ও ভালো। আবার ডিজিটাল কম্পিউটারের ফলাফলের সূক্ষ্মতা অ্যানালগ কম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান বাজারে প্রচলিত প্রায় সকল কম্পিউটারই ডিজিটাল পদ্ধতির কম্পিউটার। মাইক্রোকম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটারের উদাহরণ।



চিত্র ১.৩.৫ : ডিজিটাল সিগন্যাল



চিত্র ১.৩.৬ : ডিজিটাল কম্পিউটার

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল কম্পিউটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণামূলক কাজ থেকে শুরু করে অফিস-আদালত, ব্যাংক, বিমা, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, লেখাধুলা, বিনোদন– এমনকি ব্যক্তিগত কাজেও ডিজিটাল কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

হাইব্রিড কম্পিউটার

Hybrid Computer

অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় কম্পিউটারের নীতির সমন্বয়ে যে কম্পিউটার গঠিত তাকে হাইব্রিড কম্পিউটার বলা হয়। একে সংকর কম্পিউটারও বলা হয়। হাইব্রিড কম্পিউটারে সাধারণত উপাত্ত সংগৃহীত হয় অ্যানালগ প্রক্রিয়ায় এবং সংগৃহীত উপাত্ত সংখ্যায় রূপান্তরিত করে ডিজিটাল অংশে প্রেরণ করা হয়। ডিজিটাল অংশ প্রাপ্ত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর ফলাফল প্রদান করে। হাইব্রিড কম্পিউটার অত্যন্ত দামি। তাই কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়; যেমন– মিসাইল, সমরাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নভোযান, রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়, পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি নির্ণয়, পরীক্ষাগারে ঔষধের মান নির্ণয় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার, শরীরের তাপমাত্রা, রোগীর রক্তচাপ, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ধরনের কম্পিউটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র ১.৩.৭ : হাসপাতালে ব্যবহৃত হাইব্রিড কম্পিউটার

অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য

অ্যানালগ	ডিজিটাল
১। যে কম্পিউটার সময়ের সাথে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল উপাত্ত বা অ্যানালগ বৈদ্যুতিক সংকেতের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয় তাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে।	১। যে কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতিতে, অর্থাৎ ০ এবং ১-এর উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে থাকে তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।
২। অ্যানালগ কম্পিউটারে অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়।	২। ডিজিটাল কম্পিউটারে ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহৃত হয়।
৩। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মিটার, ওসিলোসকোপ ইত্যাদিতে প্রদর্শিত হয়।	৩। ডিজিটাল কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের পর প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণত মনিটরে প্রদর্শিত হয়।
৪। অ্যানালগ কম্পিউটার কাজ করে পদার্থবিজ্ঞানের নীতিতে।	৪। ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে গণিতের নিয়মে।
৫। অ্যানালগ কম্পিউটার একটি পরিমাপকব্যবস্থা।	৫। ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত একটি সংখ্যাগত ব্যবস্থা।
৬। এক ধরনের কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার সাধারণত অন্য ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায় না।	৬। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করা যায়।
৭। ফলাফলের সূক্ষ্মতা কম।	৭। ফলাফলের সূক্ষ্মতা অনেক বেশি।

আকার, আয়তন ও কার্যকারিতা অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

আধুনিক যুগে কম্পিউটার বলতে আমরা ডিজিটাল কম্পিউটারকে বুঝি। বর্তমানে প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই ডিজিটাল কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। আকার, আয়তন, কাজ করার ক্ষমতা, স্মৃতি ও কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে বা ডিজিটাল কম্পিউটারকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

১। সুপার কম্পিউটার (Super Computer)

২। মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer)

৩। মিনি কম্পিউটার (Minicomputer) ও

৪। মাইক্রোকম্পিউটার (Microcomputer)

সুপার কম্পিউটার
Super Computer

সুপার কম্পিউটার হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী, ব্যয়বহুল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটার। সুপার কম্পিউটার একসাথে একাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মেমরি এবং বিপুল পরিমাণ প্রক্রিয়াকরণ কাজের ক্ষমতা থাকে। আবার এ ধরনের কম্পিউটারগুলোতে কয়েকটি প্রসেসর একই সঙ্গে কাজ করে এবং প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদন করে।



চিত্র ১.৩.৮ : সুপার কম্পিউটার

সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ, নভোযান, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, মহাকাশ গবেষণা, বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ডিজাইন, সিমুলেশন, পারমাণবিক চুল্লির নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ইত্যাদি কাজে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিলে একটি সুপার কম্পিউটার আছে। ইন্টেল কর্পোরেশনের প্যারাগন, জাপানের নিপ্পন ইলেকট্রনিক কোম্পানির Super SX II, CRAY-I, CRAY-XMP, CYBER-205, ETA-D2P ইত্যাদি সুপার কম্পিউটারের উদাহরণ। বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি ২০২০) সচচেয়ে শক্তিশালি সুপার কম্পিউটার হল যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত সামিট (Sumit)। এই কম্পিউটারে ৯,২১৬টি ২২ কোরের IBM মাইক্রোপ্রসেরসর আছে।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার
Mainframe Computer

মাইক্রো ও মিনি কম্পিউটার অপেক্ষা মেইনফ্রেম কম্পিউটার আকৃতিতে বড় কিন্তু সুপার কম্পিউটারের চেয়ে ছোট। মেইনফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটি কম্পিউটার যার সঙ্গে অনেক ছোট ছোট কম্পিউটার যুক্ত করে একসঙ্গে অনেক ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে। এ ধরনের কম্পিউটারে এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রসেসর থাকে বিধায় অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন, তথ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি।

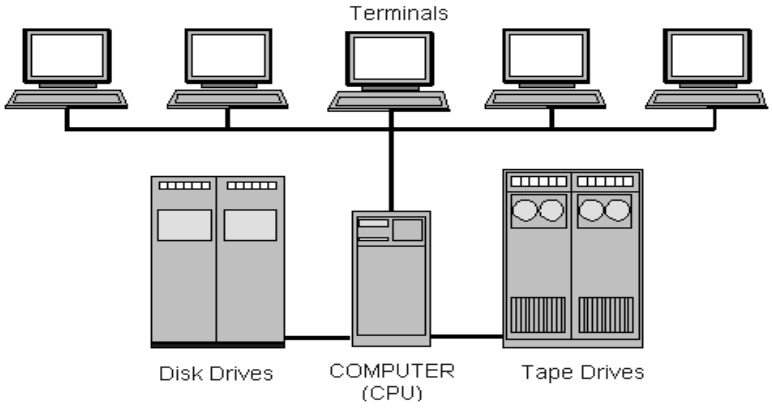


চিত্র ১.৩.৯ : মেইনফ্রেম কম্পিউটার

এ ধরনের কম্পিউটারে অনেক বড় বড় এবং জটিল ও সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ব্যাংক, বিমা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিপুল তথ্য আদান-প্রদান, সংরক্ষণ এবং জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের জন্য মেইনফ্রেম কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। UNIVAC 1100, NCR 8000, IBM 4300 ইত্যাদি মেইনফ্রেম কম্পিউটারের উদাহরণ। IBM এর নির্মিত 213 হল বর্তমানের সবচেয়ে শক্তিশালি মেইনফ্রেম কম্পিউটার। এটি প্রতিদিন 250 শেটি তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

মিনি কম্পিউটার
Mini Computer

সাধারণত মেইনফ্রেম কম্পিউটারের চেয়ে ছোট আকারের কিন্তু মাইক্রোকম্পিউটারের চেয়ে কিছুটা বড় আকারের কম্পিউটারকে বলা হয় মিনি কম্পিউটার। এ ধরনের কম্পিউটারের গতি, মেমরি এবং কাজ করার ক্ষমতা মাইক্রোকম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশি। যদিও কিছু মিনি কম্পিউটার একজন ব্যবহারকারীর ব্যবহারের উপযুক্ত কিন্তু বেশির ভাগ মিনি কম্পিউটারেই একই সাথে অনেকগুলো টার্মিনালে কাজ করা যায়।



চিত্র ১.৩.১০ : মিনি কম্পিউটার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক, হাসপাতাল, বড় বড় কারখানা, বহুজাতিক কোম্পানি, প্রযুক্তিগত গবেষণায় ও বিশ্লেষণ কাজে মিনি কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। PDP-II, IBM S/34, IBM S/36, NCR S/9290, NOVA3 ইত্যাদি মিনি কম্পিউটারের উদাহরণ।

মাইক্রোকম্পিউটার
Micro Computer

ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে সবচেয়ে আকারে ছোট এবং সস্তা কম্পিউটার হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটার। মাইক্রো এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র। তাই ক্ষুদ্রাকৃতির মাইক্রোপ্রসেসর চিপ দিয়ে যে সকল কম্পিউটার গঠিত হয় সেসব কম্পিউটারকে বলা হয় মাইক্রোকম্পিউটার। এ ধরনের কম্পিউটার সাধারণত একটি মাইক্রোপ্রসেসর, প্রধান মেমরি, সহায়ক মেমরি এবং ইনপুট আউটপুট যন্ত্রপাতি নিয়ে গঠিত। একজন ব্যবহারকারী একাই একটি মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন বলে এ ধরনের কম্পিউটারকে ব্যক্তিগত বা পার্সোনাল কম্পিউটারও বলা হয়। এ ধরনের কম্পিউটার দামে সস্তা, আকারে ছোট, সহজে বহনযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ বিধায় কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাছে খুবই জনপ্রিয়।

অফিসের কাজ ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন ছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণে, স্বয়ংক্রিয় অফিস ব্যবস্থাপনায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গৃহস্থালির কাজে, খেলাধুলায়, চিত্র-বিনোদন, এমনকি ব্যক্তিগত কাজেও আজকাল জনপ্রিয়তার সাথে মাইক্রোকম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। IBM PC, Apple Macintoch, TRS80, HP 85, IBM Pentium, Power PC, ইত্যাদি মাইক্রোকম্পিউটারের উদাহরণ।



চিত্র ১.৩.১১ : মাইক্রোকম্পিউটার

মাইক্রোকম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ

প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির সাথে সাথে মাইক্রোকম্পিউটারের আকৃতিতে নানা রকম পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের ব্যবহারিক সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে বিভিন্ন আকৃতির মাইক্রোকম্পিউটার বাজারে এসেছে। যেমন–

১। পামটপ কম্পিউটার (Palmtop Computer) বা পিডিএ (PDA)

২। ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer)

৩। নোটবুক কম্পিউটার (Notebook Computer)

৪। ডেস্কটপ কম্পিউটার (Desktop Computer); ইত্যাদি

এছাড়া ট্যাবলেট পিসি (Tablet PC), ফ্যাবলেট (Phablet), স্মার্টফোন (Smartphone) ইত্যাদিও মাইক্রোকম্পিউটারের অন্তর্ভুক্ত।

পামটপ কম্পিউটার

Palmtop Computer

PDA-এর পুরোনাম হলো Personal Digital Assistants. ১৯৯৩ সালে ইলেকট্রনিক নির্মাতারা পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিটেন্ট তৈরি করেন। পিডিএ এর প্রাথমিক ভার্সন ছিল অ্যাপলের 'নিউটন'। এ ধরনের কম্পিউটার ক্ষুদ্রাকৃতির এবং দেখতে অনেকটা ক্যালকুলেটরের ন্যায়, যা হাতের তালুর মধ্যে রেখে ব্যবহার করা যায়, এমনকি পকেটে রেখে সহজে বহন করা যায়। এটি হেল্ড বা পকেট কম্পিউটার নামেও পরিচিত।



চিত্র ১.৩.১২ : পামটপ কম্পিউটার

অন্য মাইক্রোকম্পিউটারগুলোর তুলনায় এটি সবচেয়ে ছোট এবং কম কর্মক্ষম কম্পিউটার। এ ধরনের কম্পিউটারগুলোতে কোনো প্রকার ডিস্ক ড্রাইভ থাকে না। সাধারণত টাচ স্ক্রিন ও ডিজিটাল পেনের সাহায্যে এ জাতীয় কম্পিউটারগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্প্রেডশিটের ছোট আকারের কাজ, লেখালেখি, প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর, তারিখ, এজেন্ডা তৈরি করে রাখা ইত্যাদি কাজে এ ধরনের কম্পিউটারগুলো মূলত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ল্যাপটপ কম্পিউটার
Laptop Computer

বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত মাইক্রোকম্পিউটারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কম্পিউটার হলো ল্যাপটপ। এটির প্রচলন শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি। দেখতে স্মার্ট, ওজনে হালকা এবং সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় দিন দিন এটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।



চিত্র ১.৩.১৩ : ল্যাপটপ কম্পিউটার

ল্যাপটপ কম্পিউটার দেখতে অনেকটা ছোট ব্রিফকেসের মতো যার ওপরের অংশে থাকে একটি সমতল এলসিডি বা এলইডি স্ক্রিন এবং নিচের অংশে থাকে কি-বোর্ড, পাওয়ার বাটন এবং টাচপ্যাড। রিচার্জেবল ব্যাটারি বা এসি অ্যাডাপ্টার ল্যাপটপে থাকার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে এটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালানো যায়। এটি সাধারণত 9 X 12 X 2 ইঞ্চি সাইজের হয়ে থাকে এবং ওজন ২৯ কেজি বা তার বেশি বা কম হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত কাজ ছাড়াও অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে ল্যাপটপের ব্যবহার অতুলনীয়।

নোটবুক কম্পিউটার
Notebook Computer

নোটবুক কম্পিউটার সাধারণত ল্যাপটপ কম্পিউটারের চেয়ে আকারে ছোট এবং ওজন কম হওয়ায় সহজে বহনযোগ্য। এটি দেখতে অনেকটা নোটবুকের ন্যায় বিধায় এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ ধরনের কম্পিউটারগুলোতে কি-বোর্ড, পাওয়ার বাটন, টাচপ্যাড এবং ডিসপ্লে হিসেবে এলসিডি বা এলইডি যুক্ত থাকে। কিন্তু কোনো প্রকার অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ থাকে না।



চিত্র ১.৩.১৪ : নোটবুক কম্পিউটার

ওজনে হালকা, তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা এবং সহজে বহনযোগ্য বিধায় দিন দিন এ ধরনের কম্পিউটারগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক পণ্য বা দ্রব্য বিক্রির হিসাব তৈরি, সংরক্ষণ, অর্ডার নেওয়া এবং জরিপমূলক কাজের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় কম্পিউটারগুলোর ওজন সাধারণত ১-২ কেজি এবং সাইজ ৫-১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ডেস্কটপ কম্পিউটার
Desktop Computer

ডেস্কটপ কম্পিউটার একটি বহুল ব্যবহৃত মাইক্রোকম্পিউটার। এ জাতীয় কম্পিউটার ডেস্কে বা টেবিলে স্থাপন করে ব্যবহার করা যায় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ ধরনের কম্পিউটারগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বর্তমানের ডেস্কটপ কম্পিউটারগুলোতে ডিসপ্লে ইউনিট হিসেবে সিআরটি মনিটরের পরিবর্তে এলসিডি বা এলইডি মনিটর বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র ১.৩.১৫ : ডেস্কটপ কম্পিউটার

ইনপুট, আউটপুট ইউনিট থেকে শুরু করে প্রায় সকল ধরনের ডেটা বা ইনফরমেশন ট্রান্সফার ব্যবস্থা ও কমিউনিকেশনব্যবস্থা ডেস্কটপ কম্পিউটারে থাকে। ব্যক্তিগত কাজ, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কম্পিউটারগুলোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সারসংক্ষেপ:

মূলত কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা নিজস্ব স্মৃতিভাণ্ডারে সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক কাজের নির্দেশাবলি সংরক্ষণ করে রাখে। কম্পিউটার দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জটিল হিসাব-নিকাশের কাজ নির্ভুলভাবে করা ছাড়াও বহু রকমের কাজ করা যায়। অ্যানালগ, ডিজিটাল ও হাইব্রিড কম্পিউটারই হচ্ছে গঠন, কাজের ধরন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিভাগ। যে সকল কম্পিউটার বৈদ্যুতিক সংকেতের ওপর নির্ভর করে ইনপুট গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদিত করে সেসব কম্পিউটারকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলা হয়। সাধারণত চাপ, তাপ, তরল পদার্থের প্রবাহ ইত্যাদির উঠা-নামা বা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্রিয়া সম্পন্ন করে সেসব কম্পিউটারকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলা হয়। ডিজিটাল কম্পিউটারের গতি ও কার্যকারিতা অ্যানালগ কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি ও ভালো। আবার ডিজিটাল কম্পিউটারের ফলাফলের সূক্ষ্মতা অ্যানালগ কম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান বাজারে প্রচলিত প্রায় সকল কম্পিউটারই ডিজিটাল পদ্ধতির কম্পিউটার। মাইক্রোকম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটারের উদাহরণ।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. কম্পিউটার কী?
২. ইনিয়াক ও ইউনিভ্যাক কম্পিউটারের বর্ণনা দিন।
৩. প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৪. 'সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নির্বাহই কম্পিউটারের দ্রুতগতির মূল কারণ'– ব্যাখ্যা করুন।
৫. ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
৬. পৃথিবীর প্রাচীনতম গণনা যন্ত্রের বর্ণনা দিন।
৭. অ্যাবাকাসের বর্ণনা দিন।
৮. মার্ক-১ কম্পিউটারের বর্ণনা দিন।
৯. Mark-I ও ENIAC কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
১০. কম্পিউটারের জনক কে? কেন তাঁকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়? বর্ণনা করুন।
১১. সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের বর্ণনা দিন।
১২. পূর্ণরূপ লিখুন : ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC ও ABC.
১৩. কম্পিউটারের প্রজন্ম কী? দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
১৪. চতুর্থ ও পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
১৫. কম্পিউটার প্রজন্ম কী? কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রজন্ম সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১৬. কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রজন্মের বর্ণনা দিন।
১৭. কম্পিউটারের কোন প্রজন্ম থেকে উচ্চস্তরের ভাষার ব্যবহার শুরু হয়? সেই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
১৮. কম্পিউটারের কোন প্রজন্ম থেকে মনিটরের ব্যবহার শুরু হয়? সেই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
১৯. কম্পিউটারের কোন প্রজন্ম থেকে আইসির ব্যবহার শুরু হয়? সেই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
২০. কম্পিউটারের কোন প্রজন্ম থেকে মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার শুরু হয়? সেই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
২১. কম্পিউটারের কোন প্রজন্ম থেকে উইন্ডোজের ব্যবহার শুরু হয়? সেই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
২২. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
২৩. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বলতে কী বোঝায়?
২৪. হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের পার্থক্য লিখুন।
২৫. হিউম্যানওয়্যার কী? ফার্মওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
২৬. হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ফার্মওয়্যার বলতে কী বোঝায়?
২৭. কম্পিউটার সিস্টেম কী? কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদন বা অংশসমূহ বর্ণনা করুন।
২৮. হাইব্রিড কম্পিউটার কী? উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করুন।
২৯. অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
৩০. মাইক্রোকম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩১. মাইক্রোকম্পিউটারের বর্ণনা দিন।
৩২. ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

৩৩.আকার, আকৃতি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

৩৪. গঠন বা ক্রিয়ানীতি অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

৩৫.বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোকম্পিউটারের বর্ণনা দিন।

৩৬.বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের কম্পিউটার বলতে কী বোঝায়?

৩৭. সুপার কম্পিউটার ও পার্সোনাল কম্পিউটার বলতে কী বোঝায়?

৩৮.মিনি কম্পিউটার ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৩৯.মিনি কম্পিউটার ও মেইনফ্রেম কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪০. মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও সুপার কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪১. সুপার কম্পিউটার এবং পার্সোনাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪২. ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪৩. সুপার কম্পিউটার বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের কোথায় সুপার কম্পিউটার আছে?

৪৪. ডিজিটাল কম্পিউটার কী? ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪৫. ল্যাপটপ কম্পিউটার কী? ল্যাপটপ কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Sinha P K, Computer Fundamentals
- E Balagurusamy, Fundamentals of Computers
- Sarah E. Hutchinson, Computers and Information Systems
- Norton, Introduction to Computers
- C S Frence, Computer Science
- Warford, Computer Science